মজুরের কথা

খরচ হতে থাকা জীবন

মওদুদ রহমান

বাংলাদেশে অস্থায়ী খন্ডকালিন ঝুঁকিপূর্ণ অনিশ্চিত কাজের মধ্যেই জীবিকা খুঁজতে হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে। কারখানা বা বাইরে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে কর্মরত মানুষদের কাজের অবস্থা, মজুরি বা আয় নিয়ে আমরা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তা প্রকাশ করতে চেষ্টা করি। এই সংখ্যাতেও আমরা দুজনের জীবন ও কাজের কথা প্রকাশ করছি। পাঠকদের প্রতি আহবান আপনারাও এরকম জীবনকথা সর্বজনকথায় প্রকাশের জন্য পাঠান।

মো. ইকবাল, ভাঙ্গারি দোকানের শ্রমিক

গাবতলী থেকে মিটফোর্ড হাসাপাতাল পর্যন্ত নদীর ধার ঘেঁষে বাঁধের ওপরে যে রাস্তা রয়েছে, সেই রাস্তার পাশেই মো. ইকবালের ভাঙ্গারির দোকান। বাসাবাড়ি থেকে হকাররা এবং ডাস্টবিন কিংবা নর্দমা থেকে টোকাইরা যেসব প্লাস্টিকের বোতল, বাতিল রেডিও, পুরনো টিভির প্লাস্টিকের আবরণ, রিমোট কন্ট্রোল, টর্চ লাইট, ফেলে দেয়া খেলনা, মগ, বদনা, বালতি ইত্যাদি সংগ্রহ করে তা কয়েক হাত ঘুরে চলে আসে এ ধরনের ভাঙ্গারি দোকানে। এলাকার নাম ইসলামবাগ। সোয়ারীঘাট মাছের আড়তের বেশ কাছে। লালবাগের ভেতর দিয়ে বেড়িবাঁধের রাস্তার ওপর উঠলেই এই দোকানগুলো খুঁজে পেতে কোন কষ্ট হয় না। রাস্তার ওপর প্রসেসিংয়ের জন্য নিয়ে আসা প্লাস্টিকের জিনিস ভর্তি বিরাট বিরাট সাদাকালো ব্যাগের স্তূপের মধ্যে দুই, তিন কিংবা চারজনের দলগত কর্মযজ্ঞ চলছে প্রায় প্রতিটি দোকানেই।

তখন দুপুর সাড়ে বারোটার মত বাজে। বাঁধের ওপর বেপরোয়া গতিতে ছুটতে থাকা বাস, ব্যাটারিচালিত রিকশা, মালবোঝাই ভ্যান আর ঠেলাগাড়ি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাস্তার ওপরেই এক 'নিরাপদ' জায়গা খুঁজে নিয়ে দাঁড়ালাম। ইকবাল তখন বড় সাদা ব্যাগ বোঝাই প্লাস্টিকের জঞ্জাল থেকে বাছাইয়ের কাজ করছেন। পরনে কালো শার্ট আর সাদা-নীল চেক লুঙ্গি। কসাই দোকানের চাপাতি আর খাটিয়া তাঁর সামনে দেখে অবাক হলাম। একটু পরেই বস্তার পুরনো জিনিসপত্রের স্তূপ থেকে জিনিসগুলো একটা একটা করে হাতে নিয়ে প্লাস্টিকের সাথে লাগানো অন্য ধরনের আইটেমগুলো, যেমন–রিমোটের সাথে লাগানো ইলেকট্রনিকস, রেডিওর সাথে থাকা ব্যাটারি আলাদা করতে চাপাতির জুৎসই ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছিল যে ইকবালের দোকানেও কসাই দোকানের চাপাতি-খাটিয়ার জুৎসই ব্যবহার হচ্ছে।

লালবাগের ভেতর দিয়ে বেড়িবাঁধের রাস্তার ওপর উঠলেই এই দোকানগুলো খুঁজে পেতে কোন কষ্ট হয় না। রাস্তার ওপর প্রসেসিংয়ের জন্য নিয়ে আসা প্লাস্টিকের জিনিস ভর্তি বিরাট বিরাট সাদাকালো ব্যাগের স্তূপের মধ্যে দুই, তিন কিংবা চারজনের দলগত কর্মযজ্ঞ চলছে প্রায় প্রতিটি দোকানেই।

কখন শুরু করেছেন কাজ?
আটটায়।
কয়টা পর্যন্ত করেন?
রাইত আটটা পর্যন্ত।
প্রতিদিনই কাজ করেন?
না। সপ্তায় এক দিন ছুটি। আর ধরেন বড় বড় দিনেও ছুটি।
কত টাকা বেতন আপনার?

আমার তো বেতন নাই। আমি এই দোকানের মালিক। কথাটা বলার সময় মো. ইকবালের ঘামে ভেজা মুখে দাঁতে দাঁত চেপে কাজ করতে থাকা শক্ত চোয়াল সহজ করা প্রথম হাসি দেখলাম। কাজ একটু থামিয়ে তাঁর প্রায় ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা আমার দিকে মাথা উঁচিয়ে জানালেন যে তাঁর দোকানে আরেকজন কর্মচারী আছেন। সপ্তাহে বেতন দেন ২,৩০০ টাকা। দিনে ১২ ঘণ্টা ডিউটি। লাঞ্চের টাইমে এক ঘণ্টা ব্রেক। কোন ওভারটাইম নাই।

কী হিসাবে বিক্রি করেন?
কেজি হিসাবে। সবচেয়ে ভাল মাল হইল সাদা প্লাস্টিক। ওইডার কেজি ১৬ টাকা। আর দুই নাম্বার কালা প্লাস্টিকের দাম ৯ টাকা।
দিনে কী পরিমাণ রেডি করতে পারেন?
কম কইরা হইলেও একেক জন ধরেন দুইশ কেজি। আমার দোকানে আমরা দুইজন মিইল্যা অ্যাভারেজে মনে করেন যে সাড়ে চাইরশ থিক্যা পাঁচশ কেজি মাল রেডি করি।
এত মাল কই যায়?
কী যে কন আপনে! এই লালবাগ-ইসলামবাগ জুইড়া শত শত প্লাস্টিকের ফ্যাক্টরি আছে। হেরা যত জিনিসপত্র বানায় ওইসব প্লাস্টিকের তো আমরাই সাপাই দেই। একটা নরমাল ফ্যাক্টরিতে প্রতি মাসে মাল লাগে ধরেন অ্যাভারেজে ২০ টন।

এত মাল জোগাড় করেন কিভাবে?
জোগান তো রেগুলার। বাসাবাড়ি থিক্যা হকাররা কিনে আর শহরের টোকাইরা এইসব টোকাইয়া এক করে। ওরা বেচে ছোট ছোট দোকানে। ওইখান থিক্যা কালেক্ট করে ব্রোকাররা। হেরাই প্রতিদিন মাল এইহানে সাপ্লাই দেয়।

কথা বলতে বলতে এতটুকু সময়ের মাঝেই পাশ দিয়ে ছুটতে থাকা বাস আর ভ্যানগুলোকে জায়গা করে দিতে সামনে-পেছনে করে আমার কয়েকবার জায়গা পাল্টাতে হল। কিন্তু ইকবাল নির্বিকারভাবেই রাস্তার ওপর তাঁর জায়গায় বসে ধুলা-ময়লায় মাখামাখি জঞ্জালগুলো চাপাতি দিয়ে টুকরা করে আলাদা আলাদা টুকরিতে রাখছিলেন। কথা বলতে বলতেই ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে পুরো এক বস্তা মাল বাছাই শেষ করে আরেকটা বস্তা টেনে নিয়ে আবার নিজের জায়গায় বসলেন।

পুরো রাস্তা ধুলায় প্রায় অন্ধকার করে দিয়ে বাস-ট্রাকের আসা-যাওয়া চলছেই। সেই সাথে পাশের কাল কুচকুচে নদীর ওপর থেকে হঠাৎ হঠাৎ বাতাস এসে দুর্গন্ধ যেন নাকে ঢেলে দিচ্ছিল।

এখানে কাজ করতে কোন অসুবিধা হয় না?
নাহ্! অসুবিধা আবার কিয়ের!
এই যে ধুলাবালি, নদীর পানির গন্ধ?
আরে নাহ্! এইগুলিতে অভ্যাস হইয়া গেছে। কোন সমস্যা নাই।

ইকবালের হাতের তালুতে ধুলা-ময়লার পুরু স্তর জমে গেছে। দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, একটা গ্লাভস পরলে কেমন হয়? তাহলে তো আর ময়লাটা হাতে লাগে না।
না! ওইসব পইরা কাম আগে বাড়ে না। পরছিলাম কয়েক দিন। ভালা লাগে না।

কখনও চুলকায়? ধুলায় শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয় কখনও?
না, কোন সমস্যা নাই। সাবান দিয়া হাত ধুইয়া ফালাই। কোন সমস্যা হয় না। ১৬ বছর ধইরা এই কাম করতাছি। আল্লায় দিলে অসুখ-বিসুখের কোন সমস্যা নাই।
এই দোকানে কত দিন ধরে আছেন?
এইডা ভাড়া নিছি পাঁচ বছর হইল। এর আগে অন্যের দোকানে কাম করতাম।
ভাড়া কত?
পাঁচ হাজার টাকা।
পানির সাপ্লাই, কারেন্ট–সবসহ?

হ। সব সহই। ফ্যান আছে একটা আর সন্ধ্যার পর একটা লাইট জ্বালাই।

দোকানটা ইটের দেয়ালঘেরা। কিন্তু ওপরে দেখলাম টিনের আরেক তলা। পাশে সরু, প্রায় অন্ধকার একটা গলি। ভেতরে মানুষের আনাগোনা। আপনি কি এইখানেই থাকেন?

না। আমি থাকি আঁটি। নদীর ওইপার। এইহানে মালিকে ফ্যামিলি রুমও ভাড়া দেয়। মাসে ভাড়া কোনডা পাঁচ হাজার, কোনডা সাত হাজার।

খরচাপাতি বাদে মাস শেষে লাভ থাকে কিছু?
হ ভাই। নিজের দোকান তো। আল্লায় দিলে খারাপ না। মাস শেষে ১৫-২০ হাজার টাকা উঠাইতে পারি। আবার ধরেন সময় খারাপ গেলে কমও হয়।

কোন সিজনে ভাল আপনার?
এইডা ভাই কওয়া মুশকিল। দুই-তিন বছর আগে যেমন একটা চাইনিজ অর্ডার আইছিল। তহন কালা মালডার দাম তিনগুণ হইয়া গেছিল। ওই সময় মাসে এক লাখ টাকাও কামাইছি।
এক লাখ টাকা তো অনেক। ওই রকম অর্ডার কি প্রায় সময়ই আসে?
নাহ্! ওইডা জীবনে পাইছিলাম একবারই। বলেই আবার চওড়া হাসি। বলতে থাকেন, তহন মনে করেন যে দিন-রাইত খালি দোকানেই থাকতাম। আর মাল বাছতাম।

মালের সাপ্লাই কখনও কি বন্ধ হয়? বা কমে?
না, বন্ধ হয় না। তয় মনে করেন যে শীতের সময় টোকাইরা বাইরে আহে কম। তহন কয়ডা দিন সাপ্লাই কম থাকে। ওইডাও আবার বেশি দিন না। ওই শীতের কয়ডা দিনই আর কি।

কথা বলতে বলতেই দেখলাম যে দোকান কর্মচারী হিসেবে কাজ করা আদম আলী পেছনের দিকে ছোট ছোট টুকরার নানা ধরনের প্লাস্টিকের আবর্জনা একটা বস্তার মধ্যে ঢালছে। জিজ্ঞাসা করলাম ওইগুলো দিয়ে কী হবে?

> কী যে কন আপনে! এই লালবাগ-ইসলামবাগ জুইড়া শত শত প্লাস্টিকের ফ্যাক্টরি আছে। হেরা যত জিনিসপত্র বানায় ওইসব প্লাস্টিক তো আমরাই সাপ্লাই দেই। একটা নরমাল ফ্যাক্টরিতে প্রতি মাসে মাল লাগে ধরেন অ্যাভারেজে ২০ টন।

ও! ওইগুলি? ওইগুলি মনে করেন যে বাতিল মাল। ফালায় দিমু।

এত ভারী একটা বস্তায় জমানো সবগুলো প্লাস্টিক বাতিল শুনে প্রথমে বিশ্বাস হতে চাইছিল না। আমাদের বিলাস-ব্যসন আর ভোগ্যপণ্য সামগ্রীর কয়েক কেজি বাতিল মাল মো. ইকবাল নিয়মিতভাবে নদীতে ফেলে দেন কিংবা পুড়িয়ে ফেলেন। ইকবালের দোকানের মত এমন ভাঙ্গারি প্রসেস করার অসংখ্য দোকান আছে এখানে। কিন্তু শ্রমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার কোন বালাই নেই। ধুলাবালি আর আবর্জনার রাজ্যে বসে জঞ্জাল হাতড়ে জীবিকা অন্বেষণ করা শ্রমিকদের প্রতি রাষ্ট্রের কোন দায় নেই! মনে হল এটা দুই পক্ষই মেনে নিয়েছে। মো. ইকবাল তাই হাসিমুখে বলতে পারেন, 'আল্লায় দিলে অসুখ-বিসুখের কোন সমস্যা নাই।'

নয়নতারা
প্রাক্তন গার্মেন্টস শ্রমিক

ঢাকার কামরাঙ্গীরচর রনি মার্কেট থেকে চাঁন মসজিদের দিকে যেতে যে রাস্তাটা চলে গেছে, সেটা ধরে এগোলে চাঁন মসজিদের কাছাকাছি এক জায়গায় থাকেন নয়নতারা। বাড়িটির নিচের তলায় চারপাশে ইটের দেয়াল, কিন্তু মাথার ওপরে ছাদের ঢালাইয়ের পরিবর্তে লোহার অ্যাঙ্গেল আর কাঠ দিয়ে বানানো হয়েছে দ্বিতীয় তলার জমিন। ওপরে টিনের ছাদ। গেট দিয়ে ঢোকার মুখেই মাথা বাঁচিয়ে নিচু হয়ে নতুন কোন আগন্তুককে সাবধানি চালে চলা শুরু করতে হবে, আর সেই প্রতি মুহূর্তের সাবধানতা জারি রাখতে হবে বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত। কারণ সরু গলি দিনের বেলায়ও প্রায় অন্ধকার, যেখানে জমে আছে পিচ্ছিল কাদাপানি, লোহার নানান টুকরা ঝালাই করে বানানো ওপরে ওঠার সিঁড়িতে কোন রেলিং নেই, কোন রকমে দাঁড় করিয়ে রাখা দোতলায় উঠলেই তিন ফুটের মত একটা কাঠের পাটাতনের করিডর, যেখানে আবার বড় বড় গর্তের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে নিচতলার জমিন। অবশ্য এখানকার বাসিন্দাদের সকলকেই মনে হল যে এখানে চোখ বন্ধ করে চলার মত অভ্যস্ত। হয়তো বা এ কারণেই তিন-চার বছর বয়সী বাচ্চাদের নিশ্চিন্তে খেলতে দেখলাম ওই করিডরের মত অংশে গর্তগুলোর ঠিক পাশে।

> সরু গলি দিনের বেলায়ও প্রায় অন্ধকার, যেখানে জমে আছে পিচ্ছিল কাদাপানি, লোহার নানান টুকরা ঝালাই করে বানানো ওপরে ওঠার সিঁড়িতে কোন রেলিং নেই, কোন রকমে দাঁড় করিয়ে রাখা দোতলায় উঠলেই তিন ফুটের মত একটা কাঠের পাটাতনের করিডর, যেখানে আবার বড় বড় গর্তের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে নিচতলার জমিন।

দোতলায় উঠেই পরিচয় হল নয়নতারার সাথে। তিনি এই বাসার দোতলায় আট ফিট বাই দশ ফিটের মত বক্স আকৃতির এক রুমে পরিবার নিয়ে আছেন ১০ বছর ধরে। ঘর ভাড়া ৩,০০০ টাকা। একটা টিভি, একটা লাইট, একটা ফ্যান চালাতে আলাদা করে আর কারেন্ট বিল দিতে হয় না। দোতলার বারান্দার মত করিডরের শেষ

মাথায় জোড়া গ্যাসের চুলা আছে। দোতলায় সাত পরিবার সাত ঘরে বাস করে। সবাই ওই কমন রান্নাঘরের কমন চুলা পালাক্রমে ব্যবহার করে। নিচে দুইটা পায়খানা। ওপরে-নিচে ১৪ ঘরের মানুষ ভাগাভাগি করে এ দুই পায়খানা ব্যবহার করে, যার একটিতে ময়লা আটকে পানি উপচে পড়ছে দেখে একটি পায়খানাই এখন সবার ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। গোসলখানার ঠিক পাশেই পানির কল। চব্বিশ ঘণ্টাই পানির সাপ্লাই থাকে বলে জানালেন বাসিন্দারা। গোসলখানাও সকলের চেষ্টায় খুবই পরিষ্কার দেখা গেল।

নয়নতারা যে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই ঘরেই বসালেন। ঘরে টিউব লাইট, ফ্যান–দুটোই ছেড়ে দিলেন। একজনের ঘরে অন্যজনের অবাধ যাতায়াত, বাচ্চাদের খেলাধুলা দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তাঁরা সকলে মিলে এখানে একটি বড় পরিবারে পরিণত হয়েছেন। ঘরে খাটের ওপরের দিকে টিনের দেয়ালের সাথে শূন্যে বেঁধে রাখা চারকোনা জিনিস বোঝাই বাঙ নিচের দিকে হেলে রয়েছে। ওদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই নয়নতারা হেসে জানালেন যে কোন ভয় নেই। এই ঘরের বাসিন্দারা মাথা অন্য পাশে দিয়ে ঘুমান। তাই এটি ভেঙে পড়ে গেলেও কারো মাথায় পড়বে না। তিনি অবশ্য ওই ভাঙা, ঝুলে থাকা বাক্সের নিচেই বসলেন, আর আমি বসলাম পাশের ঘর থেকে দিয়ে যাওয়া আরেকজনের প্লাস্টিকের টুলে।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা।

জিজ্ঞাসা করলাম, রান্না শেষ?

হ। ভাত-তরকারি–সব ছয়টার মধ্যেই রেডি করা লাগে।

কেন? এত সকালে রান্না করা লাগে কেন?

একে তো গ্যাস একটু বেলা বাড়লেই কইম্যা যায়। আর এই বাড়ির প্রায় সবাই সাড়ে সাতটা থিক্যা আটটার মইধ্যে কামে বাইর হইয়া যায়। যারা দোকানে কাম করে হেরা দুপুরের খাওন বাটিতে কইরা লইয়া যায়। আগে আগে ঘুম থিক্যা না উইঠ্যা রানলে পরে আর চুলার সিরিয়াল পাওন যায় না।

দোতলায় সাত পরিবার সাত ঘরে বাস করে। সবাই ওই কমন রান্নাঘরের কমন চুলা পালাক্রমে ব্যবহার করে। নিচে দুইটা পায়খানা। ওপরে-নিচে ১৪ ঘরের মানুষ ভাগাভাগি করে এ দুই পায়খানা ব্যবহার করে, যার একটিতে ময়লা আটকে পানি উপচে পড়ছে দেখে একটি পায়খানাই এখন সবার ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।

জানলাম যে তাঁদের প্রায় সব ঘরেই দুইবার রান্না হয়। নয়নতারা সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে দুপুরের ভাত আর তরকারি রান্না করেন। আবার বিকেলে রান্না করেন রাতের ভাত-তরকারি। রাতে থেকে যাওয়া বাসি ভাত দিয়ে পরের দিন সকালে নাশতা করেন। আর বাড়ির যেসব মহিলা গার্মেন্টসে কিংবা বাসাবাড়িতে কাজ করেন, তাঁরা সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে রাতের খাবার রান্না করার সিরিয়াল ধরেন।

আপনার গ্রামের বাড়ি কই?

গ্রামের বাড়ি তো আর নাই। আগে আছিল সিরাজগঞ্জে। পদ্মায় সব ভাসায় লইয়া গেছে।

বাড়ি ভাঙার সাথে সাথে এখানে চলে আসছেন? নাকি অন্য কোন শহরে আগে ছিলেন?

না। বাড়ি ভাঙ্গনের পর দুই বছর আছিলাম সিরাজগঞ্জেই এক বাঁধের উপরে। নদীর হাত থিক্যা যা কিছু বাঁচাইতে পারছিলাম তাই দিয়া কোনমতে একটা ঘর উঠাইছিলাম। এক ঘরের মধ্যেই স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর, ননদ–সবাই মিইল্যা থাকতাম। কিন্তু শেষের দিকে আমরা যারা বাঁধের উপরে আছিলাম সবার থিক্যা চান্দা নেওনের টাকা বাইরা গেল। আবার কামকাইজও আছিল না। পরে এইহানে আইলাম।

কী পরিমাণ জমি গেল নদীতে?

সব কিছুই আছিল। ১২ জন মানুষের ফ্যামিলিতে চাইল কেনা লাগত না। খাইয়া-লইয়া সামান্য কিছু বেচতেও পারতাম। বড় বড় তিনডা ঘর আছিল। হাঁস-মুরগি পালতাম। গাই আছিল, দুধও বেচতাম। উঠানে বাগান আছিল। এইহানে মনে করেন যে কিছুই তো নাই।

কোন ক্ষতিপূরণ পাইছেন?

না। ক্ষতিপূরণ আবার কেডা দিব! কোন ক্ষতিপূরণ নাই। পুরা গ্রামডাই তো নদীতে গেল। সবাই এহন আমগো মত। কেউ ঢাকায়, আবার মনে করেন যে কেউ ময়মনসিংহ, চিটাগাংয়ে গেছে।

আপনার শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর, ননদ–উনারা কই?

শ্বশুর-শাশুড়ি আমার কাছেই আছিল। শ্বশুর মারা গেছে চাইর বছরের মাথায়। আহনের পর কিছুদিন রিকশা চালাইতে পারছে। এরপর থিক্যাই অসুখে পড়ছিল। শ্বশুর মরণের পর শাশুড়ি এহন থাকে ময়মনসিংহে, দেবরের কাছে। আর ননদের বিয়া হইছে কাছেই, এই চরেই থাকে। স্বামী রিকশা চালায়।

আপনার স্বামী কী করেন?

রিকশা চালায়। কিন্তু ডেইলি বাইর হয় না। কুইড়া। বলেই হাসি ঢাকতে মুখে ওড়না টানলেন। স্বামী বাচ্চু মিয়াকে প্রথমে 'কুইড়া' বললেও পরে জানালেন যে তাঁর অসুস্থ শরীর নিয়ে প্রতিদিন রিকশা টানা সম্ভব নয়। তাই সপ্তাহে তিন-চার দিনের বেশি চালাতে পারেন না। তাঁর ঘরে পরে গিয়ে দেখলাম যে অসুস্থ বাচ্চু মিয়া শুয়ে আছেন। মুখটা ফ্যাকাসে। ঘরে মানুষজন দেখে শুকনা দেহে পরে থাকা গেঞ্জির ওপর শার্ট পরলেন। নয়নতারার ছেলের সাথেও দেখা হল। নাম আকাশ। বাড়ির কাছেই একটা সেন্টের বোতল ভরার ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। প্রতিদিন দুপুর একটায় বাড়িতে আসে খাবার খেতে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলে কত বেতন পায়?

সাড়ে তিন হাজার টাকা। প্রতি বছর মালিকে ৫০০ টাকা কইরা বাড়ায়।

কয় বছর ধরে কাজ করে?

চাইর বছর।

কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়ছে?

ফাইভ ক্লাস পর্যন্ত। এরপর আর কুলাইতে পারি নাই। কামে দিয়া দিছি।

পড়াশোনার খরচ চালাতে পারেননি শুনে জানতে চাইলাম যে আশপাশে কোন সরকারি স্কুল আছে কি না, যেখানে ছেলে-মেয়েরা বিনা বেতনে পড়তে পারে। জানলাম এই এলাকায় কোন ফ্রি স্কুল নেই। আগে ব্র্যাক স্কুলে নাকি বিনা বেতনে ছেলে-মেয়েদের পড়ানো যেত। বই-খাতা, ড্রেস–সব ফ্রি দিত। কিন্তু এখন বেতন ২০০ টাকা। আর সব কিছু কিনতে হয়। সেই সাথে কোচিংয়ের খরচও আছে।

নয়নতারা জানালেন যে তিনি আগে গার্মেন্টসে কাজ করতেন।

কিন্তু কোমরে ব্যথা হওয়ায় এখন আর কাজ করতে পারেন না।
চিকিৎসা করাইছিলেন?
না। ডাক্তারের কাছে গেছিলাম। ম্যালা খরচ। পরে আর যাই নাই। গার্মেন্টসে যখন মেশিন চালাইতাম, তখন ধরেন এক জায়গায় ১০-১২ ঘণ্টা বইয়া কাম করন লাগত। তহন থিক্যাই ব্যথা শুরু হইছে। কাম ছাড়নের পর এহন ব্যথাডা আর আগের মত নাই।

সংসারের বাজার কি আপনিই করেন?
হ। ওর বাপে কামাই আমার হাতেই দেয়। পোলায় পায় সাড়ে তিন হাজার। পুরাডাই আমার হাতে দেয়। পরে আবার ৫০০ ট্যাকা নেয়। বুঝেনই তো, মোবাইল খরচ আছে, বন্ধুবান্ধব আছে। আমিও কিছু কই না।

মাসে খরচ কেমন লাগে?
ঘরভাড়াই তো দেই তিন হাজার। এরপর ধরেন মাসে খাওন খরচ ছয়-সাত হাজার ট্যাকা তো লাগেই। কোন রকমে আছি আর কি।
এখন তো তাহলে ছয়-সাত হাজার টাকা খরচ করতে পারেন। আগে তো মনে হয় পারতেন না। নাকি?

কী কন এইডা? আগে যহন গ্রামে আছিলাম, তহন তো সব কিছুই আছিল নিজের। ক্ষেত নিজের, ঘর নিজের, হাঁস-মুরগি-গরু-বাছুর–সব নিজের। তহন তো বাজারে যাওন লাগত না। অভাবও আছিল না। এহন ধরেন ট্যাকা যা ঘরে আহে কিছুই তো রাখতে পারি না। সবই লইয়া যায়! প্রথমে লয় বাড়িয়ালা, পরে লয় মুদির দোকানদার। এরপর কিছু বাকি থাকলে মাছ-মুরগি মাঝে-মইধ্যে খাইতে পারি। কিন্তু দুধ-ডিম তো কপাল থিক্যা নাই হইয়া গেছে বহু বছর হইল।

ছেলেরে কি এই কারখানায়ই রাখবেন?
না। ওরে তো কাটিংয়ের কাম শিখাইতে চাই। কাটিং মাস্টার হইতে পারলে একটা টেইলার্সের দোকান দিলে মনে করেন যে অনেক ট্যাকা। দেহি সামনের বছর কোন এক জায়গায় কামে লাগাইতে পারি কি না।

আসলে জিডিপির পরিবর্তিত সংখ্যা কিংবা মধ্যম আয়ের দেশের তকমা ভাঙ্গারি দোকানের ইকবাল কিংবা গার্মেন্টসে কয়েক বছর কাজ করার পর কাজে অক্ষম হয়ে পড়া নয়নতারাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন করে না। তাঁরা নিজেদের অবস্থা বদলানোর জন্য কখনও আশায় থাকেন চায়নিজ মালের অর্ডার পাবার, আবার কখনও স্বপ্ন দেখেন ছেলেকে কাটিং মাস্টার বানানোর। কিন্তু সবাই মিলে একই পাকচক্রে ঘুরতে থাকেন। নিজে দোকানের মালিক হয়েও ইকবালকে ১২ ঘণ্টার কাজই করতে হয়, আর শহুরে বাসিন্দার তকমা নিয়েও নয়নতারার পরিবার বাস করে ন্যূনতম নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত হয়ে। আর এভাবেই সুখের সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে ছুটতে খরচ হতে থাকে একেকটা জীবন।

মওদুদ রহমান: প্রকৌশলী, লেখক।
ইমেইল: mowdudur@gmail.com

সর্বজনকথা প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা: আজিজ সুপার মার্কেটের প্রথমা, পাঠক সমাবেশ, জনান্তিক, অভীক, তক্ষশীলা, বেইলি রোডে সাগর পাবলিশার্স।

সিলেট: বইপত্র। ঠিকানা: বইপত্র, ৯০ রাহা ম্যানশন, সিলেট।

দিনাজপুর: বন্ধু পত্রিকা এজেন্সী। ঠিকানা: দিনাজপুর রেলস্টেশনের পাশে।

খুলনা: মৃত্তিকা।

চট্টগ্রাম: বাতিঘর।

যশোর: ১) বইহাট। ঠিকানা: সার্কিট হাউজ রোড, যশোর। ২) বিপি বুক ডিপো। ঠিকানা: মুজিব সড়ক, দড়টানা, যশোর। ৩) আনোয়ার আলম ব্রাদার্স। ঠিকানা: ৭ মুজিব সড়ক, যশোর।

রাজশাহী: চন্দন বুক পয়েন্ট। ঠিকানা: গোল্ডেন প্লাজা, সোনা দিঘীর মোড়।

ময়মনসিংহ: আজাদ অঙ্গন। ঠিকানা: ৪৪/এইচ সিকে ঘোষ রোড।

গাজীপুর: চর্যাপদ। পাঠকের রেস্তোঁরা। কলেজ রোড আউচপাড়া

ফরিদপুর: আনন্দ বিপণি। ঠিকানা: ১১ খান সুপার মার্কেট। (জনতা ব্যাংকের মোড়)।

নরসিংদি: বইপুস্তক। চেয়ারম্যান মার্কেট, পশ্চিম ব্রাহ্মণদি, খালপাড়।

বগুড়া: পড়ুয়া লাইব্রেরি। ঠিকানা: ইউনুস প্লাজা, এম. এ খান লেন। টেম্পল রোড।

সুনামগঞ্জ: 'মধ্যবিত্ত'। ঠিকানা: দোকান নং-৪, পৌর বিপণি, সুনামগঞ্জ।

যোগাযোগ ও বিকাশ নাম্বার: ০১৮৮২৪৩৪৬৬৮